ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 79- 91
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.273

শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত কিস্সা-কাহিনী বা লোককথা: লোককিম্বদন্তির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুসন্ধান

মসিউর রহমান, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, ইংরেজি বিভাগ, সামসি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.02.2026; Accepted: 21.02.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

'Kissa-kahini', which is the traditional folk narratives of the Shershabadia community, refers to the legends told by parents or ancestors to their children, upholding their cultural, moral, and historical significance. The functions of these kissa-kahini are not only entertainment but also living documents of collective memory, social values, belief systems, and the formation of Shershabadia identity. These are part of the Shershabadia literature uplifting the community's past struggles, social, cultural, and moral significance. According to historians and various records, the Shershabadias were mostly members of Sher Shah's army. They hailed from the Shershahabad pargana; later, mostly engaged in cultivation and a few with various other professions. As a representation, five Kissa-kahini are taken, covering from humourous satire like "Fus Padri O Bhonk Padri" to narratives of intelligence and survival like "Bugburhi". "Nilasman", "Nati, Burhi, Daini O Pithar Golpo" are the depiction of deception, destiny, and moral retribution. "Ganak Jolhar Nin" is about luck, intelligence, and circumstances utilising effectively, a person's unfortunate situation changes, leading to success and respect. These are analysed in different perspectives for their symbolic structure, characterization, narrative strategy, and ethical implications. This research article attains certain observations drawing upon oral accounts collected from the Shershabadia community's elders, storytellers, and the author's parents. Thus, writing aims to constitute an essential cultural archive that reflect the moral structure, social psychology and community consciousness of the Shershabadia, offering valuable insights for scholars of folklore anthropology and cultural studies.

Keywords: Literature, Shershabadia, Kissa-kahini, Culture, Community etc

প্রচলিত কিস্সা-কাহিনী বা লোককথা হলো এমন কথা বা গল্প যা পিতামাতা বা ঠাকুরদা-ঠাকুর মা, নানা-নানি, মাসি-মেসো বহু বছর ধরে কথার মাধ্যমে তাদের পোতা-পুতিন, নাতি-নাতনী, ভাগ্না ভাগ্নি ও সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করেছেন। এটিকে একটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে বেনামী, কালহীন এবং স্থানহীন গল্প হিসাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন সত্য বা কখনও আজগুবি ও কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং সাধারণ মানুষের মৌখিক ঐতিহ্যের অংশ। প্রায়শই, আমরা দেখে থাকি, লোককথা বা কিসসা-কাহিনির একটি গভীর অর্থপূর্ণ তাৎপর্য থাকে, যার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শ্রোতা বা পড়ুয়াদের একটি ইতিবাচক নৈতিক বার্তা দেওয়া। প্রতিটি

দেশের যুগ যুগ ধরে নিজ নিজ লোককথার প্রচলন রয়েছে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে। এই লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলি ওই দেশের সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র বিনোদনমূলক সাহিত্য নয় বরং এগুলি সেই সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা ঐ সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন্ত কাঠামো ও দলিল, যা সম্প্রদায়ের লোক-কিম্বদন্তির ঐতিহ্য। লিখিত ইতিহাসের সীমাবদ্ধতায় দাঁড়িয়ে লোকোকথাই বহু ক্ষেত্রে একটি সামাজের অতীত, আত্ম-সংগ্রাম, ও বিবর্তন, সেই সমাজের পরিচয়ের অনুলিখন হয়ে ওঠে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মুখ থেকে নির্গত এই লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলির মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের জীবন সংগ্রাম, দর্শন, নৈতিক শিক্ষা, বিনোদন ও লোকবিশ্বাসের বহুমাত্রিক প্রকাশ। শেরশাবাদিয়া সমাজের ক্ষেত্রেও লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বহন করে। শেরশাবাদিয়াদের দৈনন্দিন জীবন, প্রকৃতি-নির্ভরতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক আচরণবিধি এবং নৈতিক আদর্শ এই লোকায়ত কাহিনির মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে। নদী, বন, পীর-মাজার, অলৌকিক শক্তি, পূর্বপুরুষের আত্মা কিংবা শুভ-অশুভ ধারণা; সবই এসব কাহিনিতে প্রতীকী ও বর্ণনামূলক রূপ লাভ করেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই শেরশাবাদিয়াদের মধ্যেও আজও অসংখ্য বা অজস্র অশেষ কিস্সা-কাহিনী বা লোককথা যা লোককিম্বদন্তীর আধার তার জোর প্রচলন ও প্রসারণ বিদ্যমান।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে সংকলিত কিস্সা-কাহিনী ও লোককিম্বদন্তীগুলি মূলত শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত। প্রাবন্ধিক নিজে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক কাহিনি তাঁর কাছে মুখস্ত হলেও, সেগুলিকে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে পুনর্গঠন ও সংরক্ষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রবীণ ব্যক্তি, লেখক, লোকগায়ক ও গ্রামবাসীর কাছ থেকে সংগৃহীত কাহিনিগুলিকেও এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতএব, এই প্রবন্ধটি কেবল স্মৃতিচারণ নয়; বরং শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের একটি আন্তরিক প্রয়াস। প্রায় পাঁচটি লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে শেরশাবাদিয়া সমাজের যে লোককিম্বদন্তী তা জীবনবোধ, সামাজিক নৈতিকতা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগত পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই সংকলন ভবিষ্যৎ গবেষক, লোকসংস্কৃতি-অনুরাগী এবং সমাজ-ইতিহাসচর্চায় আগ্রহী পাঠকদের কাছে একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলো আলোচনা করার আগে শেরশাবাদিয়া ভাষা ও জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। শেরশাবাদিয়া, একটি কৃষি প্রধান জনগোষ্ঠী, নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগ থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গৌড়ীয় অঞ্চল মালদা ও মুর্শিদাবাদে এদের আধিক্য বেশি। এছাড়াও দুই দিনাজপুর, বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশানগঞ্জ, সুপুল, আরাড়িয়া জেলায়, ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ ও পাকুড় জেলায় এদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের কিছু অংশ রাজশাহী, চাপাই-নবাবগঞ্জে এদের বসবাস পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এই জনজাতির উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে নানাবিধ মতামত আছে। মহসিন আলী, একজন বেসরকারি মাদ্রাসার শিক্ষক ও সাহিত্য অনুরাগী, তার 'শেরশাহবাদ পরগণার অবস্থান' বইতে তিনি বিভিন্ন জনের মতামত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসেন, সেই সিদ্ধান্তগুলো হুবহু উল্লেখ করা হলো।

প্রথম সিদ্ধান্ত: সর্বপরী কাগজে বা সরকারী কাজ কর্মে কখনই সরসাবাদ লেখা হয়নি। সরসাবাদ বই থেকে বই- এ এসেছে কিন্তু শেরশাহাবাদ কথাটা সরকারী কাগজ পত্রে অনেক বার পাওয়া গেছে সুতরাং শেরশাহাবাদ শব্দটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত: উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন শেরশাহাবাদ পরগণা শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ল্যামবর্ণ লিখেছেন শিবগঞ্জ থানায় শেরশাহাবাদ পরগনাতে রয়েছে। সরসাবাদ পরগনা বলে লেখেন নি। অতএব শেরশাহাবাদ পরগনা ও শিবগঞ্জ থানা একই এলাকা একই অবস্থান।

তৃতীয়ত: শিবগঞ্জ থানা এখন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উপজেলা। এই জেলায় শিবগঞ্জ নামে এক পৌরসভা ১৫ টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং দুইশোটি মৌজা রয়েছে। তাদের কারো নাম সরসাবাদ নেই-জলপূর্ণ এলাকার জন্য তার নাম সরসাবাদ হয়নি। তার উপরে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। শেরশাহাবাদ বলেও কোন স্থানের নাম নেই। এ নাম থাকার কথা নেই কারণ এ নাম শেরশাহের দেওয়া ইচ্ছাধিন নাম। কাগজ বই পত্র ছাড়া এ নামের কোন অস্তিত্ব নেই।

চতুর্থতঃ আইন-ই-আকবরী সরসাবাদ শব্দ নিয়ে যারা লিখেছেন তারা সকলেই সরসাবাদ লিখেছেন আর যে সব লেখক সরকারী নাম পত্র দেখে লিখেছেন তারা লেখেন শেরশাহাবাদ। এস. কে. লাহিড়ী তার Criminal science and crime Delection গ্রন্থের ২৮৭ পাতায় বলেছেন, "He (Shersha) left behind him a large number of Pathan soldiers who settle in the pargana called Shershabad. These pathan came to be known as shershabadia." ডঃ মহঃ শহীদুল্লাহ তার সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধাপ গ্রন্থের ৭৫২ পাতায় বলেছেন, বাদিয়া শেরশাবাদ পরগনার অধিবাসী। M.O. Cartar তার Settlement Report গ্রন্থের ৪৩ পাতায় বলেছেন, "Shershabadiyas or more generally known as the Badiyas. The name is derived from shershabad pargana."

এই সকল ঐতিহাসিকদের কথায় জানা যায় শেরশাবাদিয়াগণ শেরশাহের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক এবং তারা শেরশাহাবাদ পরগণা থেকে এসেছে। কোন লেখক লেখেন নাই যে তারা সরসাবাদ থেকে এসেছে এবং শেরশাহের সেনাবাহিনী নয়। আলোচনার আলোকে বলা যায় যে ঐতিহাসিক দলিল, সরকারি নথি ও প্রামাণ্য গবেষকদের বক্তব্য অনুযায়ী শেরশাহাবাদ নামটিই অধিক গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ। শেরশাবাদিয়ারা শেরশাহ সূরীর সেনাবাহিনীর উত্তরসূরি এবং তাঁদের পরিচয় শেরশাহাবাদ পরগণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

এই শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা কাহিনীগুলিকে একে একে textual- cultural lens-এ আলোচনা করা হলো, যেখানে রাখা হয়েছে শেরশাবাদিয়া ভাষায় লোককথা বা কিস্সাগুলো এবং তার বাংলা ভাষায় অনুবাদ। তারপর সেগুলোকে বিভিন্ন আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণে; বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ, প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার, নৈতিক শিক্ষা এবং সমাজচিত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শেরশাবাদিয়া সমাজের নানান দিক, জীবনদর্শন, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রজন্মান্তরে সংরক্ষণ অবসম্ভবী প্রয়োজনীতা বরং শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনীগুলির ভেতরে লুকিয়ে আছে সমাজের নৈতিক কাঠামো, পারিবারিক সম্পর্ক, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, লোকবিশ্বাস, ভাগ্যচক্র এবং মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিপদ মোকাবেলার বর্ণনা। এসব উপাদান সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এই আলোচনার মাধ্যমে শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকজ জ্ঞান, বিশ্বাস ও জীবনদর্শনকে একাডেমিক আলোচনার কেন্দ্রে আনার জন্য একটি প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, তা নিচে বিবৃত হলো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-১:

ফুস্ পাদড়ি ও ভঁক্ পাদড়ি:

অ্যাক্ রাজা আছিল। রাজার অ্যাক্খান ম্যালাই সুন্দরী, টকটকা বহু বিহা কইরা আনলো। বহু সব দিক দিয়া ভালোই আছিল। কিনতো একখান খুত আছিল তার; সে বেজায় ফুস্ ফুস্ কইরা পাদতো। আর সেই পাদের

গন্ধে রাজবাড়ী শুদ্ধ সবাই ছি! ছি! কইরা উঠতো। এতে রাজার মন বেজায় ব্যাজার হইয়া গেল। তার ভীষণ লজ্জা লাগতো। শেষে একদিন রাজা সেই বউ রাণীটাকে রাজবাড়ী থাইকা তাড়াইয়া দিল আর আরেকখান তেমনই সুন্দরী বহু বিহা কইরা আনলো। এই লতুন বহু রাণী আগকারটার মতো সারাক্ষণ ফুস্ ফুস্ কইরা পাদতো না। সে বছরে খালি একবারই পাদতো, তাও ভঁক্ কইরা জোরসে। গন্ধও প্রায় হইতো না। তাই রাজা আর রাজ্যের প্রজা, সবাই খুব খুশী। দিন যাইতে যাইতে দেখা গেল, সেই একবারের পাদের সময় ঘনাইয়া আসতেছে। তখন গোটা রাজবাড়ী শুদ্ধ সবাই ভয় পাইয়া গেল। যে যেদিকে পারলো, দৌড় দিয়া পালাইলো। কিনতো পাশের ঘরে শুইয়া আছিল রাজার খুব বুড়হা বাপ। বার্ধক্যের ভারে সে আর কুনো দিকেই পালাইতে পারলো না। ঠিক এমনি সময় আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া বহু রাণী ভঁক্ কইরা পাদ দিল। আর সেই বিকট আওয়াজে রাজার বুড়হা বাপটা তাৎক্ষণিক অক্কা পাইয়া গেল। এই দৃশ্য দেইখা রাজা তখন ক্ষেদে কাঁদিয়া উঠলো আর কইলো, "ভঁক্ পাদড়ি থিকা ফুস্ পাদড়ি বোহু হামার ভালুই আছিলো। কিনতো, এই ভঁক্ পাদড়ি বোহু অ্যাস্যা হামার বুড়হা বাপটাকে ম্যারাই ফেললো।"

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: এক রাজা ছিল রাজার একখানা সুন্দর বউ ছিল বউটি সব দিক থেকেই ভালো কিন্তু বড় দোষ ছিল তার এই যে সে প্রায় ফুসফুস করে বাদ দিতো। এই পাদের বেজায় দুর্গন্ধ হত তাই রাজবাড়ী সভায় তাকে নিয়ে ছি! ছি! করতো। এতে রাজার ভীষণ মন খারাপ ছিল। রানীর এই কাজে সে ভীষণ লজ্জিত ছিল, ফলে একদিন সে বিরক্ত হয়ে লজ্জায় বৌরানী কে তাড়িয়ে দিল নিজের বাড়ি থেকে এবং তৎক্ষণাৎ আরো একটা সুন্দর বউ বিয়ে করে আনলো। তবে ইনি আগের মত সারাক্ষণ ফুসফুস করে পাদতো না। বরং বছরে সে একবার করে পাদ দিতো। তাও আবার করে খুব জোরে ভোঁক করে। তার ফলে গন্ধ হয় না বললেই চলে। তাই রাজা প্রজা সবাই খুশি এবার। কিন্তু দেখতে দেখতে এরই মধ্যে তার অর্থাৎ ওই দ্বিতীয় বৌরানীটির পাদার সময় ঘনিয়ে আসে। গোটা এটা শুদ্ধ সকলেই তটস্থ হয়ে ওঠে যে যেদিকে পারলো পালালো ভয়ে। কিন্তু পাশের ঘরে শুয়ে থাকা রাজার বৃদ্ধ পিতা বয়সের কারণে সে পালাতে পারল না, নিরুপায় হয়ে শুয়ে থাকতে হলো ঘরের মধ্যে। বার্ধক্যের কারণে পালাতে না পারায় রানী খুব জোরে, আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে পাদ দিলে রাজার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু ঘটলো। তাই দেখে রাজা তখন এই বলে ক্ষেদ করে কেঁদে ওঠে যে, 'ভঁক্ পাদড়ি' থেকে 'ফুস্ পাদড়ি' বউ আমার বেশি ভাল ছিল। কিন্তু 'ভঁক্ পাদড়ি' বউ থেকে 'ফুস্ পাদড়ি' অনেক ভালো হল কারণ 'ভঁক্ পাদড়ি' বউ এসে আমার বৃদ্ধ পিতাকে মেরেই ফেলল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: উপরের লোক কাহিনীতে সামাজিক নৈতিকতা, রসবোধ, ক্ষমতা-কাঠামো, মানবিক দুর্বলতা, এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা ব্যঙ্গ রসিকতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আলোচ্য কাহিনীটি প্রথম দর্শনে অশালীন ও হাস্যকর মনে হলেও এর অন্তর্নিহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীরভাবে বহন করে যে কারনে হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক লোক-ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়। শেশেরশাবাদিয়া লোকো কথাই শারীরিক আচরণ দৈহিক দুর্বলতা কিংবা তথাকথিত অশোভন বিষয়কে কেন্দ্র করে গল্প রচনা প্রবণতা দেখা যায়, যার উদ্দেশ্য কেবল হাস্যরস সৃষ্টি নয় তার সাথে সাথে সমাজের ভন্ডামি ও কৃত্রিম স্বাধীনতার মুখোশ খুলে দেওয়া। এখানে 'ফুস্ পাদড়ি' ও 'ভঁক্ পাদড়ি' -এই দ্বৈত প্রতীকের মাধ্যমে তুলনামূলক বিচার ও মানবিক সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরা হয়। কাহিনীটি পরিনাম বনাম তীব্রতা (frequency vs intensity) ধারনাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরে।

এই কাহিনীতে অতিশয়োক্তি (hyperbole), ব্যঙ্গ (satire) ও লোক রস (folk humour) প্রধান নান্দনিক উপাদান দিয়ে ভরা আছে। এখানে তুলনামূলক বিচার ও অনুশোচনা মনস্তত্ত্বকে সম্মুখে উদ্ভাসিত করে। রাজা

প্রথম রানী কে তার ছোট ছোট ভুলের জন্য ত্যাগ করে দ্বিতীয় রানী কে গ্রহণ করে। এই দ্বিতীয় রানী অনেক গ্রহণযোগ্য হলেও সময়ের সঙ্গে বোঝা যায় দ্বিতীয় রাণীর যে বড় ভুল সেটা আগের রানীর ছোট ছোট ভুলের থেকে অনেক মারাত্মক এবং ক্ষতিকর। এই কাহিনীতে বোঝানো হয়েছে, মানুষ প্রায়ই তো পরিচিত সমস্যার চেয়ে অজানা ও সম্ভাব্য ভয়ংকর সমস্যাকে বেছে নেই, যার ফল আরো মারাত্মক হয়। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু এই ঘটনাটা নিছক হাস্যরসের স্তর থেকে তুলে এনে নৈতিক শিক্ষার স্তরে নিয়ে যায়। আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি বৃদ্ধ পিতা আসলে সমাজের দুর্বল অক্ষম শ্রেণীর প্রতীক। যারা সব সময় বিপদের সম্মুখীন হয় এবং নিজের জীবন দিয়ে বিপদকে রক্ষার চেষ্টা করে। কর্তব্য দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত বহন করে।

অবশেষে বলা যায়, এই শেরশাবাদিয়া কাহিনীটি সমাজে লোককিম্বদন্তির স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য, রসিকতা, ব্যঙ্গ, অতিশয়তি ও নৈতিক শিক্ষা সমন্বিত একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, এটি শুধু বিনোদনের জন্য নয় বরং সমাজের অন্তর্গত সত্য, মানবিক দুর্বলতা ও সাংস্কৃতিক বোধকে প্রজন্মান্তরে বহন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকসাহিত্যিক দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: জলদি করে নেওয়া সিদ্ধান্ত বড় অনুশোচনার কারণ হয়।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-২:

বাগ-বুড়হি:

নানি যে কিনা বুড়হিয়া গেছে, যাইবে নাতনির বাড়ি, তো পার হিয়া যাইতে হৈইবে বনবাদাড়। তো ডহারে বাঘের সাথে দেখা। বাগ তো কহিছে বুড়ি তোর গোস খাবো। কিন্তু বুড়হির গা এত রোগা আর জীর্ণশীর্ণ, যে খালি হার হাড়-মাসটুকু পাইবে। তাও বাঘ খাইতে চাহিছে, তখন বুড়হি বাগ কে বুঝান দিয়া কহিলো, সে এখন নাতনির বাড়ি যাইছে সেখানে ভালো-মন্দ খেয়া টাইয়া মোটা হইয়া আসবে, তখন হাকে খাইস। বাগ এবার রাজি হইলো। নাতনির বাড়ি থৈইক্যা ফিরার ওয়াক্তে নানি কহিলো যে, ডহরে বাগ-ভাল্লুকের মসিবত। ওয়াকে কদমা ভ্যাঙো তার ভিতরে ভরইয়া পা দিয়া ঠেইলা জোরসে গড়িয়ে দিলে সে উদ্ধার পাবে ও বাড়হি যাইতে সক্ষম হবে। নাতনী তাই করল, কদমা গড়হিয়া চললো- 'কদমা গড়হ গড়হ', 'কদমা গড়হ গড়হ'। বুড়হি আরো জোরে চল্লো, 'টাই-টুই চল কদমা টাই-টুই'। বাগ দেখতে পাইয়া পা দিয়ে ভেঙে ফেললে বুড়হি ব্যাহির হলো। এবারকার তো বাগ বুড়হির গোস খাইবে। বুড়হি কহিলো, যে গোস খাইলে মুখ-হাত ধুয়ার দরকাজ পড়বে তাই লদ্দীর কানধাই গিয়া খাইলে ম্যাল্লাই ভালো হইবে। বাগ এটাইতেই রাজি হইলো। সেখানে বুড়হি একমুঠ্ঠা বালু লিয়া জোরসে ফেললো বাগের চোখের ভিত্রে। বাগ তখন অন্ধ হইয়া চোখ রগড়াইতে লাগলো। বুড়হি লিচিন্দে নিজের বাড়হি গিয়া পৌঁহছালো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: নানি যে এখন বৃদ্ধ, যাবে নাতনির বাড়ি। মাঠ তারপর জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। পথে বাঘের সঙ্গে দেখা, বাঘ বুড়ির মাংস খেতে চায় কিন্তু বুড়ি এতই রোগা আর জীর্ণশীর্ণ। যে তার শরীরে শুধু হাড় আছে। একটুকুও মাংস নেই, তাই সে বাঘকে বুঝিয়ে বলল যে সে নাতনির বাড়ি থেকে ভাল ভাল খাবার খেয়ে মোটাসোটা হয়ে আসুক, তারপর খাবে। বাঘ তাতেই রাজি হল। নাতনির বাড়ি থেকে ফেরার সময় নানি বলল যে পথে বাঘ-ভাল্লুকের বিপদ। তাকে কদমা ভেঙে তার ভিতর ভরে পা দিয়ে ঠেলে জোরে গড়িয়ে দিলে সে উদ্ধার পাবে ও বাড়ী যেতে সক্ষম হবে। নাতনী তাই করল, কদমা গড়িয়ে চলল- 'কদমা গড় গড়', 'কদমা গড় গড়'। বাঘ দেখতে পেয়ে পা দিয়ে ভেঙে ফেললে কদমাটা, আর সেখান থেকে বুড়ি বের হল। এবার তো বাঘ বুড়ির মাংস খাবে। বুড়ি বলল যে মাংস খেলে মুখ-হাত ধোয়ার

প্রয়োজন পড়বে, তাই নদীর ধারে গিয়ে খেলে অনেক ভাল হবে। বাঘ তাতেই রাজি হল। সেখানে বুড়ি একমুঠো বালি নিয়ে জোরে ফেলল বাঘের চোখের ভিতর। বাঘ তখন অন্ধ হয়ে চোখ রগড়াতে লাগল। বুড়ি নিরাপদে, নিজের বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: এই শেরশাবাদিয়া লোককাহিনিগুলো মৌখিকভাবে সমাজে প্রচলিত আছে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন দিক, গ্রামীণ বাস্তবতা, বোন জঙ্গল কেন্দ্রিক যে ভয়, লোকোজো বুদ্ধি ও কৌশল এর মাধ্যমে বিপদকে মোকাবেলা করা ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। এখানে দেখা যায় যে বাঘ হিংস্র ও শক্তিশালী প্রাণী থাকা সত্ত্বেও মানুষের বুদ্ধির কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাই এখানে বৃদ্ধা নারীর অসম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েছে। শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও নানী মানসিকভাবে শক্তিশালী ছিল। এই কাহিনীটি লোকসাহিত্যের সেই দিকটা বর্ণনা করেছে, যেখানে শক্তির থেকে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

শেরশাবাদিয়া সমাজে বাঘ একটি বিপদের প্রতীক, অশুভ শক্তির প্রতীক। কিন্তু এখানে বাঘকে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে বিশ্বাস ও নিষ্পাপের সারল্যতা লোকসাহিত্যেরই রসবোধ ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য বহন করে। কদমার ভিতর ঢুকে গড়িয়ে যাওয়া দৃশ্যটি শেরশাবাদিয়া সমাজের একটি রূপক। এটিতে দেখানো হয়েছে গ্রামীণ জীবনে কিভাবে আশেপাশের উপাদানকে ব্যবহার করে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া এবং চোখে বালি ছিটিয়ে দেওয়া বাস্তব উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। এই লোক কাহিনীর মধ্য দিয়ে বোঝানো যায় বাচ্চাদের যে, কিভাবে বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়। সাথে সাথে এখানে বয়স্কদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাই, এটি শেরশাবাদিয়া সমাজের নৈতিক পরীকাঠামো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: বুদ্ধি, সতর্কতা ও উপস্থিতমন, দুর্বল মানুষকে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-৩:

নাতি, বুড়হি, ডাইনি ও পিঠার গাছ:

নানির কাছে নাতির হ্যাণ্ঠা জিদ, সে ধরাইছে যে পিঠ্যা খাইবেই। চাইল আর সিননির পিঠ্যা, খাইতে ম্যালাই টেস্ট, মন্দ লয়। খাইতে খাইতে অ্যাকটা পিঠ্যা ব্যাঁইচা গেলছে। নানি কহিলো, যে মাটির ভিতরে পুঁইত্যা দিতে। পিঠার গাছ হল। মাঝে মাঝে বুড়হির নাতি গাছে চড়হা পিঠা খায়। একদিন ডাইনি বুড়হি এসে পিঠা চাহিলো। গাছের নীচে নেমে যেই ডাইনি বুড়হিকে পিঠা দেওয়া, অমনি বুড়ি ছেলেটাকে বস্তাতে লিয়া চলল জঙ্গলে নিজের বাড়ি, সেখানে তাকে কেটে তার মাংস খাবে। রাস্তাতে ডাইনি বুড়হি বস্তা রেখে একটা ঝোপঝাড়ে পায়খানায় বসেছে। আশেপাশে ছিল গরুর রাখাল। ওরা বস্তা খুলে বুড়হির নাতিকে উদ্ধার করল আর বস্তার ভিতর ইট-পাথর- কাঁটা ভরে বস্তার মুখ যেভাবে বাঁধা ছিল ঠিক সেইভাবে বেঁধে দিল। ডাইনি বুড়হি এসে বস্তাটাকে মাথায় নিয়ে ছুটে চলল। ইট-পাথর আর কাঁটার যন্ত্রণাকে সে মনে করল যে ছেলেটা লাথির গুঁতো দিচ্ছে আর চিমটি কাটছে। জঙ্গলে গিয়ে বস্তা খুলতে ডাইনি বুড়হির খুব দুঃখ হল। অনেকদিন কেটে গেল। ডাইনি বুড়হি একদিন সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে আবার বস্তাবন্দি করে জঙ্গলে নিয়ে এল। সেখানে ডাইনি বুড়হির এক মেয়ে ছিল। বুড়ির নাতি মেয়েটাকে বলল যে আমার পোশাক তোমাকে খুব মানাবে। মেয়েটা তাই করল। মেয়ের শাড়ি পরে ছেলেটা ডাইনির মেয়ে সেজে বলল মা মাংস খাবো। ডাইনি বুড়হি ছেলেটাকে কেটে, স্নান করে আসতে বলল,

আসলেই মেয়েটা কাটা পড়ে গেছে। আর কি মেয়ে ফিরে আসে, সে তো আসলে ছেলে। নদীতে গিয়ে বুড়ির নাতি হেল্যা নিজের বাড়ি ফিরা গেলো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: নাতি নানির কাছে জেদ ধরেছে, পিঠা খাবে। চাল আর গুড়ের পিঠা, খেতে মন্দ নয়। খেতে খেতে একটা পিঠা বেঁচে গেল। নানি বলল যে মাটিতে পুঁতে দাও। পিঠার গাছ হল। মাঝে মাঝে বুড়ির নাতি গাছে চড়ে পিঠা খায়। একদিন ডাইনি বুড়ি এসে পিঠা চাইল। গাছের নীচে নেমে যেই ডাইনি বুড়িকে পিঠা দেওয়া অমনি বুড়ি ছেলেটাকে বস্তাতে নিয়ে চলল জঙ্গলে নিজের বাড়ি, সেখানে তাকে কেটে তার মাংস খাবে। রাস্তাতে ডাইনি বুড়ি বস্তা রেখে একটা ঝোপঝাড়ে পায়খানায় বসেছে। আশেপাশে ছিল গরুর রাখাল। ওরা বস্তা খুলে বুড়ির নাতিকে উদ্ধার করল আর বস্তার ভিতর ইট-পাথর- কাঁটা ভরে বস্তার মুখ যেভাবে বাঁধা ছিল ঠিক সেইভাবে বেঁধে দিল। ডাইনি বুড়ি এসে বস্তাটাকে মাথায় নিয়ে ছুটে চলল। ইট-পাথর আর কাঁটার যন্ত্রণাকে সে মনে করল যে ছেলেটা লাথির গুঁতো দিচ্ছে আর চিমটি কাটছে। জঙ্গলে গিয়ে বস্তা খুলতে ডাইনি বুড়ির খুব দুঃখ হল। অনেকদিন কেটে গেল। ডাইনি বুড়ি একদিন সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে আবার বস্তাবন্দি করে জঙ্গলে নিয়ে এল। সেখানে ডাইনি বুড়ির এক মেয়ে ছিল। বুড়ির নাতি মেয়েটাকে বলল যে আমার পোশাক তোমাকে খুব মানাবে। মেয়েটা তাই করল। মেয়ের শাড়ি পরে ছেলেটা ডাইনির মেয়ে সেজে বলল মা মাংস খাব। ডাইনি বুড়ি ছেলেটাকে কেটে, স্নান করে আসতে বলল, আসলেই মেয়েটা কাটা পড়ে গেছে। আর কি মেয়ে ফিরে আসে, সে তো আসলে ছেলে। নদীতে গিয়ে বুড়ির নাতি সাঁতরিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: আমাদের দেশের আদিবাসী অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় জাতির ডাইনি প্রথা ও বিশ্বাস, নরমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে গল্পটিতে। পিঠার গাছ হওয়ার বিষয়টা অবাস্তব হলেও আমাদের খাদ্যবস্তুর মূলে রয়েছে মাটি, জল, আলো ও বাতাস। মানুষের বুদ্ধি কলা-কৌশলের কাছে শুধু ডাইনি বুড়ি নয় পৃথিবীর সবকিছুকেই হাতের মুঠোয় করতে পেরেছে এই মানুষ। নানি চরিত্রটি স্নেহ ভালোবাসা ও আদরের প্রতিভু নাতির কাছে, অন্যদিকে নাতি সহজ সরল বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে ডাইনি এক অশুভ শক্তি সামাজিক ভয় ও শিশুকে চুরি করা, তাই বিপদের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আর এর ফলে গ্রামীণ সমাজে শিশুদের সতর্ক করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংযোজিত হয়েছে।

রাখালদের ভূমিকা আমাদের সমাজে দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতা ধারণা প্রকাশ করে। দ্বিতীয়বার ডাইনীর হাত থেকে ছেলেটার আত্মরক্ষা ছলনার মাধ্যমে মুক্তি, শিশু বুদ্ধি ও তার উপস্থিত কৌশলকে গুরুত্ব দেয়। নারীর পোশাক গ্রহণ ও পরিচয়-বদলের কাহিনী লোকো কথার প্রচলিত রূপান্তর কৌশলের অংশ। সবশেষে বলা যায় এই কিস্সাটি শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত নৈতিক শিক্ষা, ভয় নিয়ন্ত্রণ শিশুদের সামাজিকীকরণ এবং লোকবিশ্বাসভিত্তিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: ভয় অশুভ শক্তির সামনেও সতর্কতা মানবিক সহযোগিতা ও বুদ্ধিই মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-৪:

গনক জোলাহ-র নিন্:

অ্যাকটা আনকোরা গাঁয়ে, এক জোলাহ কিছু চাষযোগ্য জমিন লিয়া বসবাস করছিল। মাঠে হাইল-বলদ লিয়া চাষ করতে যায়, আর তার বোহু পঁহাতে লাহরি হিসাবে একটা হাতের উুটি আর ধৈনার চাটনি লিয়া হাজির। এ্যাতে কিন্তু প্যাট ভরে না। উুটি গড়হা হয় ম্যালাই অথচ বেশির ভাক খ্যায়া লাই ওর বোহু, জোলাইন। পরের

দিন জোলাহ মাঠে গিয়া হাইল র‍্যাইখা ও বলদজোড়া বাবলা গাছে ব্যাঁইন্ধ্যা তড়িঘড়ি বাড়ীর কান্টা থাইকা হাঁইসালঘরের একটা ফুট্টা দিয়া সব দেখলো, ডুটি গড়হার সংখ্যা সাত। তারপর সে লককইরা তাড়াহুড়া কৈরা মাঠে পৌঁহছা গেলো হাল বাহিতে এবং চালু কৈরা দিলো। সেদিনকেও ওর বহু সময়মত একটা ডুটি আর ধৈনার চাটনি লিয়া হাজির। তার স্বামী ডুটি দেইখা উঁচু গলায় বলল, “থপ থপ্যাতে সাত ডুটি, হাকে দিব্যাহ একটা ডুটি।” স্ত্রী ভাবল নিশ্চয় তার স্বামী গণকঠাকুরের মত অনেক বিদ্যা, তাই সে জ্যানা লেছে। বাড়ী গিয়া সে একথাটা পাড়াহ-প্রতিবেশীদের কাছে কানফুসড়াইলছে। কয়েকদিন পর ওই গাঁয়ে এক ধোপার গাধা চুরি হৈয়া গেলছে। ধোপা গণনা করার জন্য আসে জোলাহ-র বাড়ি। তার আগের দিন সন্ধ্যায় জোলাহ ধোপার গাধাটাকে দেখেছিল গাঁয়ের পশ্চিম দিকে একটা গোঁড়হার পাশে গো-ভাগাড়ে। ধোপা আসলে সে তার অ্যাগনায় ধূপধূনা জ্বাইলা বিভিন্ন নক্সা আঁকা গাধার দিক নির্দেশ কৈরা ধোপাকে জানিয়ে দিল। গাধার প্রাপ্তিতে ধোপা বেজাই খুশি হইলো। একজন ভাল গণকদার হিসাবে জোলাহ-র সুনাম চারিসাইডে ছোড়িয়ে পইড়লো। এইবার ওরঘি দ্যাশের রাজকন্যার হার চুরি হইলো। হারখান ঢুরহা যে দিতে পারবে সে অনেক টাকা পুরস্কার পাবে কিন্তু কেউ খোঁজখবর দিতে পারে না। শেষে রাজার সেপাইহি সেই নামকরা গণকদার জোলার কাছে হাজির। সাত দিনের মধ্যে রাজকন্যার গলার হারের সন্ধান না দিলে জোলাহসহ ওার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কচুকাটা করে ম্যাইরা ফেলা হবে। জোলাহ কোন গণকদার নয়, সে মহা চিন্তায় পড়লো। রাইতে তার নিন্ হয় না, সে সারা রাইত নিন্‌কে ডাকতে থাকে, “নিন আয়সেক”, “নিন আয়সেক” কিন্তু কিছুতেই নিন্ আসে না। ওই দ্যাশের কোন এক গ্রামের নিন নামের এক মহিলা হার চুরি করেছিল। সে চুপি চুপি নিশুতি রাইতে জোলাহর বাড়ির পিছনে এসে শুনছে গনকদার তার নাম ধইরা হাঁকছে। নিন মনে মনে ভাবল যে রাজার হাতে পড়লে তার রেহাই নেই, তাই সে খার্রাহখারি জোলাহর পায়ে পড়ে বলল যে সে রাজকন্যার হার চুরি কইরা রাজ অট্টালিকার পাছাদিকে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছাইয়ের স্তূপের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু খবরদার রাজার কানে তার নাম যেন উচ্চারণ করা না হয়। জোলাহ এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাতদিন গত হইলে তার পরদিন সকালবেলা সে স্যাজাগুজা একেবারে রাজদরবারে হাজির। ধূপধুনা জ্বালিয়ে, তেলপড়াহ, জলপড়াহ করে অনেক রকমের মন্ত্র আওড়ালো, তারপর সেখান থেকে উঠে ছাইয়ের স্তূপের ভিতর থৈকা রাজকন্যার হার বের করে দিল। রাজা-রানী, রাজকন্যা, রাজদরবারের অন্য সবাই খুব খুশি। জোলাহকে রাজদরবারে নিয়োগ করা হল। তার পরিবারের থাকার জন্য দালানঘর তৈরী হল। জোলা তার বৌ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগলো।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: কোনো এক গ্রামে, জোলা কিছু চাষযোগ্য জমি নিয়ে বসবাস করছিল। মাঠে হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে যায়, আর তার বৌ সকালবেলার জলখাবার হিসাবে একটা হাতের রুটি আর ধনে পাতার চাটনি দিয়ে আসে। এতে কিন্তু পেট ভরে না। রুটি তৈরী হয় বেশি অথচ বেশী ভাগ খেয়ে ফেলে তার বৌ, জোলাইন। পরের দিন জোলা মাঠে গিয়ে হাল রেখে ও বলদজোড়া বাবলা গাছে বেঁধে তড়িঘড়ি বাড়ীর পিছনে রান্নাঘরের একটা ছিদ্র দিয়ে সব দেখল, রুটি তৈরির সংখ্যা সাত। তারপর সে দ্রুতবেগে মাঠে পৌঁছে চাষ করতে শুরু করল। সেদিনও তার বৌ সময়মত একটা রুটি আর চাটনি নিয়ে হাজির। তার স্বামী রুটি দেখে উঁচু গলায় বলল, “থপ থপ্যাতে সাত ডুটি, হাকে দিব্যাহ একটা ডুটি।” স্ত্রী ভাবল নিশ্চয় তার স্বামী গণকঠাকুরের মত অনেক বিদ্যা, তাই সে জেনে ফেলেছে। বাড়ী গিয়ে সে একথাটা পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে প্রচার করে। কয়েকদিন পর ওই গ্রামের এক ধোপার গাধা চুরি যায়। ধোপা গণনা করার জন্য আসে জোলার বাড়ি। তার আগের দিন সন্ধ্যায় জোলা ধোপার গাধাটাকে দেখেছিল গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা জলাশয়ের পাশে গো-ভাগাড়ে। ধোপা এলে সে তার আঙিনায় ধূপধূনা জ্বালিয়ে বিভিন্ন নক্সা এঁকে

গাধার দিক নির্দেশ করে ধোপাকে জানিয়ে দিল। গাধার প্রাপ্তিতে ধোপা খুব খুশি হলো। একজন ভাল গণকদার হিসাবে জোলার সুনাম চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ল। এবার ওই দেশের রাজকন্যার হার চুরি হলো। হারের সন্ধান যে দিতে পারবে সে অনেক টাকা পুরস্কার পাবে কিন্তু কেউ খোঁজখবর দিতে পারে না। শেষে রাজার সেপাই সেই নামকরা গণকদার জোলার কাছে হাজির। সাত দিনের মধ্যে রাজকন্যার গলার হারের সন্ধান না দিলে জোলাসহ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কচুকাটা করে মেরে ফেলা হবে। জোলা কোন গণকদার নয়, সে মহা চিন্তায় পড়ল। রাতে তার ঘুম হয় না, সে সারা রাত ঘুমকে ডাকতে থাকে, "নিন আয়সেক", "নিন আয়সেক" অর্থাৎ ঘুম আয়, ঘুম আয় কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। ওই দেশের কোন এক গ্রামের নিন নামের এক মহিলা হার চুরি করেছিল। সে চুপি চুপি নিশুতি রাতে জোলার বাড়ির পিছনে এসে শুনছে গনকদার তার নাম ধরে ডাকছে। নিন মনে মনে ভাবল যে রাজার হাতে পড়লে তার রেহাই নেই তাই সে সোজাসুজি জোলার পায়ে পড়ে বলল যে সে রাজকন্যার হার চুরি করে রাজ অট্টালিকার পিছনে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছাইয়ের স্তূপের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু খবরদার রাজার কানে তার নাম যেন উচ্চারণ করা না হয়। জোলা এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাতদিন গত হলে তার পরদিন সকালবেলা সে সেজেগুজে একেবারে রাজদরবারে হাজির। ধূপধুনা জ্বালিয়ে, তেলপড়া, জলপড়া করে অনেক রকমের মন্ত্র আওড়ালো তারপর সেখান থেকে উঠে ছাইয়ের স্তূপের ভিতর থেকে রাজকন্যার হার বের করে দিল। রাজা-রানী, রাজকন্যা, রাজদরবারের অন্য সবাই খুব খুশি। জোলাকে রাজদরবারে নিয়োগ করা হল। তার পরিবারের থাকার জন্য দালানঘর তৈরী হল। জোলা তার বৌ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: উপরের শেরশাবাদিয়া কিস্সাটি মূলত মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি যেখানে ভাগ্য বুদ্ধি খুব পরিস্থিতির কাকতালীয় মিশ্রণ আছে। এখানে যে জোলা আসলেই ঘনকদার নয়, আকস্মিক ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে কাকতালীয়ভাবে রাতারাতি সমাজে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। স্ত্রী কর্তৃক রুটি বণ্টনের ঘটনায় তার বলা উক্তিটি লোকবিশ্বাসের মাধ্যমে অলৌকিক জ্ঞানের রূপ পায়, যা সমাজে গণকদার হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে। আমাদের দেশে জোলাকে সাধারণত মূর্খ বা বোকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গোয়ালা বা ঘোষও তাই। শোনা যায় ষাট বছর বয়সে গোয়ালার বুদ্ধি হয় কিন্তু লোককথায় এরাই আবার এক উন্নত মর্যাদার অধিকারী। চরিত্রের এরূপ বৈপরীত্যের মধ্যে এক বিশেষ গুণ ও চমক আমাদের মুগ্ধ করে তাছাড়া একই ধরনের অতি সাধারণ নিরীহ দুঃখময় আর্থিক জীবনের পরিবর্তন আমাদের জীবনের গতিময়তা আর উন্নত ও সভ্য জগতের অনুগামী হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে এই কিসসা কাহিনীতে যে ধোপার গাধা চুরির ঘটনাও কাকতালীয় জ্ঞান ও লোকাচারের সাহায্যে সমাধান হয়, ফলে জোলার খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়। রাজকন্যার হার চুরির ঘটনায় লোকবিশ্বাস, ভয় ও মানসিক চাপ কাহিনির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। "নিন আয়সেক" উচ্চারণের ভুল ব্যাখ্যা চোরের মনে ভয় সৃষ্টি করে এবং সে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দেয়। এই কাহিনির মাধ্যমে শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকবিশ্বাস, গণকদারি সংস্কৃতি, ভাগ্যনির্ভরতা ও সাধারণ মানুষের আকস্মিক সামাজিক উত্তরণের চিত্র ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে এতে ক্ষমতা ও আতঙ্কের সম্পর্ক, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। হাস্যরসের আড়ালে কাহিনিটি মানুষ ও সমাজের বিশ্বাসপ্রবণতাকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরে, যা শেরশাবাদিয়া লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনি জোলাকে নিয়ে আরও অনেক তৈরি হয়েছে। যেমন কিছু লোককথা প্রচালিত আছে, হাটে গিয়ে কদমাকে ঘোড়ার ডিম মনে করে কেনা, পাগলা হাতিকে বিষ খাইয়ে মেরে রাজার কাছে বীর বলে পরিচিতি। বনের বাঘ মাঠে ঢুকে গ্রামের রাখাল ও চাষিদের খেয়ে ফেলে। রাজা ওই বীর

জোলাকে পাঠাল বাঘ মারতে। হাতে তরবারি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার পর বাঘের সঙ্গে তার দেখা। ভয়ে গাছে ওঠে সে কাঁপতে লাগল। গাছের নীচে বাঘ হঠাৎ হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল একেবারে বাঘের গলায়। বাঘ মারা পড়ল। মৃত বাঘের কান কেটে জোলা নিয়ে এল রাজদরবারে। রাজা খুব খুশি। জোলার বীরত্ব দেখে রাজা তার একমাত্র সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিল। জোলা রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: ভাগ্য, বুদ্ধি ও পরিস্থিতিকে সঠিক কাজে লাগালে, মানুষের খারাপ অবস্থা পরিবর্তন হয়, আসে সফলতা ও সম্মান।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনী-৫:

নীলাসমান:

অ্যাকখান দ্যাশ আছিল, সেই দ্যাশে এক রাজা বাস করত দুই রানী লিয়া। বড় রানীটার নাম বোড়কি আর ছোট রানীটার নাম ছোটকি। রাজা ছয় মাসের লাইগা শিকারে বাহার হইয়া গেল। রাজা ছোটকিকে খুব পিয়ার করতো, এই দেইখা বোড়কির বুকের ভিতর আগুন জ্বলত। বোড়কি একদিন মিথ্যা কহা বানাইয়া লিখল যে ছোটকি চরিত্রহীন আর কলঙ্কিনী। সেই খাত বোড়কি এক সিপাহির হাতে দিয়া বনে রাজার কাছে পাঠাইল। চিঠি পড়হা রাজা বেজাই গোঁসা করলো। সে সিপাহিকে হুকুম দিল, ছোটকিকে বনে লিয়া গিয়া জাল্লাদ দিয়া তার হাত কাইট্যা ফেলবি। রাজার দেওয়ান ছোটকিকে নিজের মাইয়া মতো পিয়ার করতোক। বনবাসে যাওয়ার সময় দেওয়ান ছোটকির হাতে দুইটা খুব দামী হীরে-খোঁচিত অলংকার দিল। জল্লাদের কাছে একখানা লাল দিয়া নিজের জান বাঁচাইল আর আরেকখানা ছোটকি নিজের খরচের লাইগা রাখল। ছোটকি তখন পুঁয়াতি আছিল। বনের ভিতরেই তার দুইটা পুত জন্ম নিল; নাম তুইলো নীল আর আসমান। রাইত-দিনে দুই ভাই বড় হইতে লাগল। এক বছরেই দশ বছরের মতো হইয়া গেল। একদিন দুই ভাইয়ের মনে হইল; বনের মাঝখানে একখানা নগর পাতব। তারা মন্টু আর ঝন্টুকে ব্যাগাততা কইরলো। মন্টু-ঝন্টু বনের ভিতর নগর বানাইয়া দিল। তারা নীল-আসমানকে আশি মনের পুত্তি আর চুরাশি মনের ডান্ডা বানাইয়া দিল। খেলাধুলায় দুই ভাইয়ের সঙ্গে আর কেউ পাইরা উঠতো না। খেলা করত করতে করতে দুই ভাই দূর-দূর দ্যাশে ঘুইরা পড়ল। মা ছোটকি দক্ষিণ কোণে যাইতে মানা করছিল, কিন্তু তারা শোনে নাই। এক দেশে গিয়া ছোট ভাই আসমানের খুব ভোক লাগলো আর তিস্সা ম্যালাই লাগল। বড় ভাই নীল ঘোড়া গাছে বাইন্ধা দিয়া পানি-খাবার আনতে বাহির হইল। সেই ফাঁকে বড় ভাই আরেক দেশে গিয়া বিহা কইরা ফেলল, আর ছোট ভাইয়ের কথা একখিবারে ভুইলা গেলো। এইদিকে নীল-আসমানের বাপের জাহাজ সমুদ্দরের এক চরে আটকাইয়া গেল। নরবলি না দিলে জাহাজ নড়ে না। আসমান এক গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছিল। পাশের গাছে ঘোড়া বাঁধা আছিল। রাজ্যের চারজন সিপাহি ভাবল- ঘোড়াচোর। তারা আসমানকে ধইরা নরবলি দিতে লিয়া গ্যালো। শহরে ঢোল-ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা দিলো, সকাল দশটায় ঘোড়াচোরের বলি দেওয়া হৈবে। ঠিক সময়ে বড় ভাই নীল হাজির হইল। সে যুদ্ধ কইরা ছোট ভাই আসমানকে উদ্ধার কইরা মায়ের কাছে লিয়া আইল। এরপর তার বাপু আর বোড়কির অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগল। তারা কাজের লাইগা ছুটোছুটি করত। শেষে তারা ছোট রানীর বাড়িতেই কাজ পাইয়া গেলো। অনেক দিন পরে সবাইর পরিচয় হইলো। সব সত্য বের হইলো। রাজা নিজের ভুল বুইঝা অনুতপ্ত হইয়া পসতাইতে লগলো, সকলে মিলে একসঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। নীল হল রাজা আর দেওয়ান হল মন্ত্রী।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর বাংলা অনুবাদ: কোন এক দেশে, এক রাজা বসবাস করতেন দু-রানী নিয়ে, বড় রানী যাকে বোড়কি আর ছোট রানীকে ছোটকি বলতো। রাজা ছয় মাসের জন্য শিকারে বের হয়। রাজা ছোট রানীকে ভালবাসত বলে ছোট রানীর ওপর বড় রানীর খুব হিংসা। ছোট রানী একজন দুশ্চরিত্রা ও কলোঙ্কিনী এই বলে একটা অভিযোগপত্র লিখে বড় রানীকে নিয়ে আর সেই পত্র সিপাহিকে দিয়ে পাঠাল বনে রাজার কাছে। রাজা সিপাহিকে আদেশ দিল রানিকে বনবাসে নিয়ে গিয়ে জল্লাদ দিয়ে হাত কেটে ফেলতে। রাজার দেওয়ান ছোট রানীকে মেয়ের মত ভালবাসতেন। বনবাস যাওয়ার সময় তিনি ছোট রানীর হাতে অতি মূল্যবান দুটো হীরে খোঁচিতো অলংকার লাল দিলেন তার মধ্যে একটা লাল জল্লাদকে দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করলেন আর অন্যটা নিজের খরচের জন্য ছোটকি রেখে দিলেন। গর্ভবতী ছিলেন, বনে ছোট রানীর দু ছেলের জন্ম হয়। তাদের নাম নীল ও আসমান। দু-ভাই দিনে রাতে বাড়ে। এক বছরেই দশ বছরের সমান হল। তাদের ইচ্ছা হল বনে নগর পত্তন করবে। তারা মোন্টু আর ঝোন্টুকে অনুরোধ করলে সেখানে নগর স্থাপন হল। মন্টু ও ঝন্টু তারা দু-ভাইকে আশিমনের পুত্তি ও চুরাশি মনের ডান্ডা বা লাঠি তৈরি করে দিলেন। খেলাধুলায় দু-ভায়ের সঙ্গে কেউ পারে না। খেলা করতে করতে দু-ভাই দূর দেশ পর্যন্ত চলে গেল। ওদের মা দক্ষিণ কোণে যেতে বারণ করল। কোন এক দেশে ছোট ভাইয়ের ক্ষিধা ও পিপাসা পেয়েছে। বড় ভাই ঘোড়াকে বেঁধে জল ও খাবার আনতে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে বড় ভাই অন্য একদেশে বিয়ে করে ছোট ভাইয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। নীল ও আসমানের বাবার জাহাজ সমুদ্রের একটা চরে ঠেকেছিল। নরবলি না দিলে জাহাজ চলবে না। নীল গাছের তলায় ঘুমিয়ে ছিল, পাশে গাছে বাঁধা ঘোড়াকে দেখতে পেয়ে ঘোড়াচোর বলে রাজার চারজন সিপাহি তাকে ধরে নিয়ে গেল নরবলি দিতে। শহরে ঢোল ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হলো, সকাল দশটায় ঘোড়াচোরকে বলি দেওয়া হবে। সময়মত তার বড় ভাই নীল এসে হাজির। শেষে ছোট ভাই আসমানকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল মায়ের কাছে। তার বাবা ও বড় রানীর অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকে যেতে লাগল। কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। তারা ছোট রানীর বাড়িতে কাজ পেল। বহুদিন পরে পরিচয় প্রকাশ পেলে সত্য সামনে এলো। রাজা নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হলেন, সকলে মিলে একসঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। নীল হল রাজা আর দেওয়ান হল মন্ত্রী।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: এই শেরশাবাদিয়া লোকো-কাহিনীতে বড় রানির ঈর্ষা (jealousy), ষড়যন্ত্র (conspiracy) ও রাজার অবিশ্বাস (disbelief), যাচাই-বাছাই না করে জল্লাদের মাধ্যমে বনবাস ও হত্যার আদেশ, যারা আমরা শ্রোতা (audience) তাদের কাছে অসহনীয় হলেও কাহিনীর অগ্রগতিতে দৈবিক কৃপায় জাস্টিসের পথে গেলে, ছোট রানী রক্ষা পায়। বনে ছেলের জন্ম, লাঠি-পুত্তি খেলা, বিশ্বকর্মা ও তার ছেলে কর্তৃক নগর পত্তন তৎকালীন সমাজচিত্রের অনুসারী। এইধরনের বহু ঘটনা মঙ্গলকাব্যেও বর্তমান। লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস অনুযায়ী দৈবকৃপা আর ভাগ্যকে স্বীকার করা হয়েছে। রাজা ও বড় রানী নিজেদের দুষ্কর্মের ফলভোগের পর পুনরায় সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির ধারা আধুনিক ছোটগল্প, উপন্যাস আর লোকসাহিত্যের (folk literature) ইঙ্গিতবাহী। দেশের রাজার বিনা তদন্তে লোকের কথা বিশ্বাস (blind faith) করে যে বিচার দিয়েছে আসলে রাজকীয় বিচার ব্যবস্থার দুর্বল থাকে উদঘাটন করে। জল্লাদের মাধ্যমে বনবাস ও কেটে ফেলার আদেশ শ্রোতার কাছে দুঃখজনক ও condemnable হলেও ভাগ্যচক্রে দেওয়ানের সহায়তায় ছোট রানীর রক্ষা পাওয়া লোকবিশ্বাসে প্রচলিত divine grace ও destiny–র ধারণাকে শক্তিশালী করে। বনে সন্তানের জন্ম, লাঠি-পুত্তি খেলা, বিশ্বকর্মা ও তার পুত্রের দ্বারা নগর প্রতিষ্ঠা, এসব ঘটনা social imagination ও folk realism, এর সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলকাব্যের মতো এখানেও moral justice কাজ করে, যেখানে দুষ্কর্মের ফল হিসেবে রাজা ও বড় রানী শাস্তি পায় এবং পরিণামে সুখ-দুঃখের চক্র সম্পূর্ণ হয়। তাই বলা যায়, এই

narrative structure আধুনিক short story, novel ও folk drama-র পূর্বাভাস বহন করে, আগেকার বিচার ব্যবস্থা ও পাওয়ার মেকানিজম- কিভাবে কাজ করে তারই জ্বলন্ত ধরনের হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

শেরশাবাদিয়া লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীর নীতিকথা: অন্যায়, হিংসা ও অন্ধবিশ্বাসের খারাপ পরিণতি অবসম্ভবী।

উপসংহার:

শেরশাবাদিয়া সমাজে প্রচলিত লোককথা বা কিস্সা-কাহিনীগুলি শুধুমাত্র entertainment বা বিনোদনের জন্য নয় বরং ওই সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আধারের এক জীবন্ত দস্তাবেজ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে oral transmission বা মৌখিকভাবে ছড়িয়ে পড়া কিস্সা-কাহিনীগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাহসিকতা, ভায়, কুসংস্কারের জন্য, বিভিন্ন পাহাড়সম সমস্যা সমাধান ইত্যাদির খন্ড চিত্র ফোক উইসডামের মাধ্যমে তার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে। এগুলোতে সমাজের বিশ্বাস, ভীতি, আনন্দ এবং মানবিক দুর্বলতার পাশাপাশি রসবোধ ও হাস্যরসও মিশ্রিত রয়েছে।

প্রথম কিস্সা-কাহিনী ‘ফুস্ পাদড়ি ও ভঁক্ পাদড়ি’ মূলত মানবিক দুর্বলতা, সামাজিক লজ্জা এবং পরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করে। যদিও কিস্সা-কাহিনী প্রথম দর্শনে হাস্যকর বা অশালীন মনে হতে পারে, তবুও এর আড়ালে রয়েছে সমাজের মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষা। কিস্সা-কাহিনীটি দেখায় যে ছোট ছোট ত্রুটি ও দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, ধৈর্য ও সহনশীলতার মান গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া এটি প্রমাণ করে যে পরিচিত সমস্যার তুলনায় অজানা বিপদ কখনো বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। দ্বিতীয় কাহিনী ‘বাগ-বুড়হি’ এবং তৃতীয় কাহিনী ‘নাতি, বুড়হি, ডাইনি ও পিঠার গাছ’ মানব বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিপদ মোকাবেলার দৃষ্টান্ত দেয়। এখানে দেখা যায়, শক্তিশালী ও হিংস্র প্রাণী যেমন বাঘ বা ডাইনি মানুষের বুদ্ধি ও সতর্কতার কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। এই কাহিনীগুলো সমাজে বুদ্ধি, সতর্কতা এবং সহযোগিতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। বয়স্ক ও শিশুদের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা কাহিনীর মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা সমাজের নৈতিক কাঠামো ও সতর্কতা প্রদর্শনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। চতুর্থ কাহিনী ‘গনক জোলাহ-র নিন্’ ভাগ্য, কাকতালীয় ঘটনাবলী এবং সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণ প্রদর্শন করে। জোলার চরিত্রে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষও পরিস্থিতি অনুযায়ী বুদ্ধি ও সাহস প্রদর্শন করে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করতে পারে। লোকবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উপাদান যেমন ‘নিন আয়সেক’ উচ্চারণের মাধ্যমে গল্পে অলৌকিকতা ও প্রজ্ঞা মিশ্রিত হয়েছে। এটি শেরশাবাদিয়া সমাজে ভাগ্য, বিশ্বাস ও সামাজিক উত্তরণের মধ্যে সম্পর্কের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। পঞ্চম কাহিনী ‘নীলাসমান’ শিশুদের দ্রুত বয়স বৃদ্ধির গল্পের মাধ্যমে সাহস, উদ্যোগ ও ক্ষমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এখানে কল্পনাশক্তি ও অতিপ্রাকৃত উপাদান সমাজের নৈতিক ও শিক্ষামূলক দিককে শক্তিশালী করে। কাহিনীটি দেখায় যে, সঠিক পরিকল্পনা, সতর্কতা ও পরিবেশের সঠিক ব্যবহার মানুষের জীবনে সাফল্য এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনে সহায়ক। শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনীগুলিতে দেখা যায় যে মানুষের দৈহিক দুর্বলতা, ভয় বা সামাজিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও বুদ্ধি, সাহস, সতর্কতা এবং মানবিক সহযোগিতা মানুষের উপর অশুভ শক্তির প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারে। গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, নদী, বন, পশু-পাখি এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত প্রতীক ও রূপক কাহিনীগুলিতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলো শুধু রম্য বা বিনোদনমূলক নয়, বরং সমাজের নৈতিক শিক্ষা, আত্মরক্ষা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা প্রজন্মান্তরে বহন করে। শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনী ও লোককথাগুলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, প্রাকৃতিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক অভ্যাস সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। লোককথার মাধ্যমে শিশুদের সতর্কতা, বুদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, পরিবার ও সম্প্রদায়ের বন্ধন এবং সামাজিক নৈতিকতার ধারণাও এগুলোর মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে প্রতিফলিত হয়েছে। উপরন্তু, কিস্সা-কাহিনী ও লোককথাগুলোতে হাস্যরস, ব্যঙ্গাত্মক উপাদান এবং অতিশয়করণ ব্যবহার করে সমাজের ভন্ডামি, অজানা ভয় এবং মানুষের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো মানুষের মানসিক ও সামাজিক চেতনা উজ্জীবিত করে, যা কেবল বিনোদন নয় বরং চিন্তাশীল ও শিক্ষামূলকও। সর্বশেষে বলা যায়, শেরশাবাদিয়া কিস্সা-কাহিনী ও লোককথা সমাজের ইতিহাস, নৈতিক শিক্ষা, বিশ্বাস, সাহসিকতা, বুদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এগুলো প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত একটি জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে কাজ করে, যা ভবিষ্যৎ গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, লোকসাহিত্য-অনুরাগী এবং পাঠকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই সংকলনের মাধ্যমে শেরশাবাদিয়া সমাজের লোকসংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবন, নৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধকে অনন্যভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. অহাব, আব্দুল। শেরশাবাদ ও শেরশা বাদিয়া। ২য় প্রকাশ, শেরশাবাদিয়া বিকাশ পরিষদ, জুলাই ২০২১।
২. আহম্মদ, মৌলভী সেখ ইদ্রিস। বঙ্গদেশের সরল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইস্টবেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯২০।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস। বাংলার ইতিহাস: দ্বিতীয় ভাগ। দেশ পাবলিশিং, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী। ২য় সংস্করণ, দে বুক স্টোর্স, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
৫. ভট্টাচার্য, মলয় শংকর। মালদহ চর্চা। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা মঞ্চ, জানুয়ারি ২০১১।
৬. হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব দ্য ডিস্ট্রিক্ট মালদাহ। ট্রুবনার অ্যান্ড কো., ১৮৭৬।
৭. Cartar, M. O. Settlement Report. Calcutta: Government Press.
৮. ল্যামবোর্ন, জি. ই। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স: মালদা। এন. এল. পাবলিশার্স, ১৮৯৫/১৯১৮।
৯. সামাদ, আব্দুস। বাদিয়া বার্তা। ৩২ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, এপ্রিল ২০১১, বাদিয়া বার্তা প্রকাশনী।
১০. সামাদ, আব্দুস। শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য। ১৬ই আগস্ট ২০০৩, বাদিয়া বার্তা প্রকাশনা।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য:

১. বাসেদ, আব্দুল। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা পশ্চিমবঙ্গ।
২. বিবি, আবেদা। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। তালগাছি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা পশ্চিমবঙ্গ।
৩. সাবিনা ইয়াসমিন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। বালুয়াঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।
৪. রহমান মতিউর। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার/মৌখিক তথ্য। বালুয়াঘাট, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।